জঙ্গিদের অর্থের যোগান আসে যেভাবে

রিপোর্ট : **খোন্দকার তানভীর জামিল**

বিদেশী অর্থে ইসলামী জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড এখন শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সিংহভাগ অর্থই আসে কুয়েত, সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের দাতাসংস্থাগুলো থেকে। আর তা পেয়ে থাকে বিভিন্ন ইসলামী এনজিও, যারা গত এক দশকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে মাকড়সার জালের মতো। এসব এনজিও স্যানিটেশন, শিক্ষা, মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করার নামে রেজিস্ট্রেশন নেয় এনজিওবিষয়ক ব্যুরো থেকে। কিন্তু এসব এনজিওদের অনেকগুলোই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নামে বিদেশ থেকে টাকা এনে জঙ্গি তৎপরতার কাজে ব্যয় করছে দীর্ঘদিন ধরে।

ইসলামী এনজিওদের সঙ্গে জঙ্গি গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে সরকারকে দেড় বছর আগে সতর্কও করেছিল দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। ওই গোয়েন্দা প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, 'জামাআতুল মুজাহিদিন নামে একটি জঙ্গি সংগঠন সৌদি আরব, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের দাতাসংস্থাগুলো থেকে নিয়মিত বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে।' এই জঙ্গি সংগঠনটির অর্থ যোগানদাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুয়েতের রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ এবং এর অঙ্গসংগঠন ইয়াহিয়া তুওরাস। ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০০২ সালের ৯ জানুয়ারি ইসলামিক হেরিটেজকে কালো তালিকাভুক্ত করে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জামাআতুল মুজাহিদিনের প্রধান নেতা ড. গালিবকে গ্রেপ্তার এবং সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করে সরকার। কিন্তু অর্থের যোগানদাতা সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। ফলে জামাআতুল মুজাহিদিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও বাংলাদেশে এনজিওগুলোর তৎপরতার কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। বরং গত ১৭ আগস্ট সারা দেশে ৬৩টি জেলায় একই সময় ৫০০ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এর দায়দায়িত্ব স্বীকার করে জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ। বোমা হামলার ঘটনায় দেশে-বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সরকারও প্রথমবারের সঙ্গে আতঙ্ক বোধ করে। জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতা রোধে কিছুটা। সক্রিয়তা আরম্ভ হয় যার সূত্র ধরে ইসলামিক হেরিটেজের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শুধু ইসলামিক হেরিটেজ নয়, আরো অনেক ইসলামী এনজিও বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গি তৎপরতায় অর্থায়ন এবং উদ্বুদ্ধকরণে জড়িত রয়েছে। আর এ কাজে ব্যবহৃত টাকার সিংহভাগই আসে হুন্ডির মাধ্যমে। আবার অনেক এনজিও বৈদেশিক অর্থ ছাড়ের জন্য অনুমোদন এবং হিসাব দেয়ার বিষয়টি এড়াতে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো থেকে রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছে না। ফলে বেআইনি অনেক এনজিও গজিয়ে উঠেছে।

ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিদেশী অনুদান নেয়ার আগে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন নিতে হয়। এরপর ওই অর্থ ব্যয় করার প্রতিবেদনও ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হয়। পরে ব্যুরো তা খতিয়ে দেখে। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ইসলামী এনজিও তা না মানলেও আজ পর্যন্ত কোনো এনজিওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যুরোতে রেজিস্ট্রেশন না নেয়ার প্রথা। জানা গেছে, এসব এনজিও জেলা সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তর, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে থাকে। এরপর এনজিওগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকেই বৈদেশিক অর্থ ছাড়ের অনুমোদন নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত বৈদেশিক অনুদাননির্ভর এনজিও কার্যক্রম তদারকিতে দেশে একক কোনো সংস্থা নেই। ফলে এসব এনজিওর অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার অন্ধকারেই আছে। এর সঙ্গে হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধভাবে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলামী এনজিওগুলোর জন্য বিদেশী অর্থ আসায় এ খাতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যক্রম শুধু এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে জমা দেয়া বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষা, বছরে কাগুজে আয়-ব্যয় নিরীক্ষার মতো রুটিন কাজেই সীমাবদ্ধ। এমনকি দেশে কতগুলো ইসলামী এনজিও কাজ করছে তাও জানে না এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। সরকারের আর দশটি সংস্থার মতো এখানেও ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অনেক কিছু বৈধ করে নেয়া যায়। তবে এসোসিয়েশন অব মুসলিম ওয়েলফেয়ার এজেন্সিস অব বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠনের হিসাবে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এ দেশে ইসলামী এনজিওর সংখ্যা ২৪৫।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াত নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হওয়ার পর ওই মন্ত্রণালয় থেকে ইসলামী এনজিওদের নিবন্ধন নেয়ার হিড়িক পড়ে। গত দু'বছরে দু'শতাধিক ইসলামী এনজিওকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

উত্তরায় রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ

থেকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এর অধিকাংশই পরিচালনা করছে জামায়াত-শিবিরের লোকজন। এসব এনজিও ইসলামী পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় তথা লোক দেখানো সেবাধর্মী কাজের আড়ালে জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এর অর্থ আসছে মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি আমেরিকা, ব্রিটেন এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে। এসব অর্থ একদিকে জামায়াত-শিবিরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে কাছে লাগছে, অন্যদিকে জঙ্গি তৎপরতায় সারা দেশ অস্থিতিশীল করে তুলছে। বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার অর্থায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় অনেক দিন ধরেই লেখালেখি হচ্ছে। দ্য কোরিয়া টাইমসে গত বছরের ১৩ আগস্টে একটি প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিল। এতে বলা হয়, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে কর্মরত দাওয়াতুল ইসলাম নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে তিন বাংলাদেশী নাগরিক ৮৭ হাজার মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জন্য। এরপর তারা ওই বছরের এপ্রিল মাসে ঢাকার উদ্দেশে সিউল ত্যাগ করেন। জানা গেছে, ইসলামী এনজিওগুলো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সরকার এবং ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ইসলাম প্রচার এবং মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এজন্য তারা বাংলাদেশের মসজিদগুলোর ছবি ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে তা ধনী ব্যক্তিদের দেখিয়ে অর্থ এনে থাকে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দাতাসংস্থা এবং ব্যক্তির কাছে সংগৃহীত অর্থের সিংহভাগই আসে হুন্ডির মাধ্যমে, যা ব্যয় করা হয় জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, এর আগে পাকিস্তানের লাহোর এবং করাচি থেকে ইসলামী জঙ্গিদের জন্য অর্থ পাঠানো হতো বাংলাদেশে। মার্কিন সরকারের চাপে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সরকার এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেয়ায় অর্থপাচারের রুট বদলে গেছে। হুন্ডির মাধ্যমে ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রামে এখন টাকা পাঠানো হয়ে থাকে। আর এ টাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে স্থানীয়ভিত্তিক অসংখ্য এনজিও। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ বাংলাদেশী কাজ করায় ওইসব দেশ থেকে এ দেশে নিয়মিত টাকা পাঠানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি বড় অংশ আসে হুন্ডির মাধ্যমে যাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী হুন্ডি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এখন এসব হুন্ডি সিন্ডিকেটের কিছু অংশের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জঙ্গিবাদী কাজে বিদেশ থেকে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে অবাধে বিপুল পরিমাণ টাকা আসছে। এই প্রবণতা শুরু হয় নব্বইয়ের দশক থেকে। ৯/১১-এর পর পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে স্বদেশে অর্থ পাঠানোয় ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকও হুন্ডিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠানো বাড়িয়ে দেয়। তারপরও হুন্ডির যে তৎপরতা, ধারণা করা যায় তার বড় অংশই ইসলামী এনজিওগুলোর জন্য আসছে।

বরিশালের আল ইকরাম এনজিও থেকে গ্রেফতারকৃত দুই জন

মায়ানমারের সামরিক জান্তার অত্যাচারে প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান দেশ ত্যাগ করে কক্সবাজার এলাকায় এসে আশ্রয় নেয় নব্বইয়ের দশকে। এখনো শরণার্থী শিবিরে প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান মানবেতর জীবনযাপন করছে। এদের কথা বলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য আনছে ইসলামী এনজিওগুলো। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সৌদি আরবভিত্তিক ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়থ, রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী, কুয়েতের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কমিটি, কাতারের চেরিটেবল সোসাইটি, আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মুসলিম এইডসহ একাধিক দেশী-বিদেশী সংস্থা। জানা গেছে, এসব সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের সিংহভাগই খরচ হয় সামরিক প্রশিক্ষণে।

উল্লেখ্য, নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানরা মায়ানমারে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গঠিত একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সম্মিলিত প্লাটফর্ম হচ্ছে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)। ২০০১ সালের ২২ জানুয়ারি এই সংগঠনের চিফ অব আর্মি স্টাফ মোঃ সেলিমকে চট্টগ্রাম থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানায়, 'রোহিঙ্গাদের জন্য আসা বিদেশী অর্থ সাহায্যের পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবির। আর তাদের সুপারিশ ছাড়াই ওই সব বিদেশী সংগঠন ও ব্যক্তিদের থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য আসে না।' জানা গেছে, রোহিঙ্গা মুসলমানদের সামনে রেখে আড়ালে এ দেশের ছাত্র যুবকদের ইসলামী জঙ্গি হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয় ওই সময় থেকেই।

ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনাম আরনট প্রতিষ্ঠিত বেনোভোলেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ শুরু করে ১৯৯২ সালে। ঢাকায় তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অন্যতম পরিচালক ছিলেন খোদ এনাম আরনট। এর অফিস ছিল ঢাকার উত্তরায়। মিসরীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক মোহাম্মদ তোহা এই সংস্থার প্রধান ছিলেন। ১৯৯৯ সালে একটি গোয়েন্দা সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওসামা বিন লাদেনের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট (আইআইএফ) সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য বেনোভোলেন্সের বাংলাদেশ শাখাকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে। পাকিস্তানি নাগরিক মোহাম্মদ সাজেদের মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ টাকা বাংলাদেশের ৪২১টি মাদ্রাসার ছাত্রদের ট্রেনিংয়ের জন্য খরচ করা হয়েছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার বিমান হামলার পর বিশ্বব্যাপী এ সংস্থার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের কোনো শাখায় এই সংস্থার কোনো হিসাব থাকলে তা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। আর গত ২৬ আগস্টে বরিশালে আল ইকরাম ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে ব্যবস্থাপকসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আল ইকরামের নির্বাহী পরিচালক জিয়াউর রহমান জিয়া ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলায় জড়িত বলে পুলিশ দাবি করছে। ওই দিন বরিশালে বোমা হামলার ঘটনার মূল নায়ক ছিল সে। এরপর দিনই সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।